ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের বৈশিষ্ট্য: আল্লাহর একত্ব

সাইয়্যেদ কুতুব

[??????????? (worldview) : মূল আরবিতে সাইয়্যিদ কুতুব তাসাওউর (??????????????? ?????????????????) বযবহার করেছেন। সাধারণত তাসাওউর শবেদর অর্থ করা হয় 'concept'/'conception' বা ধারণ হিসেবে। তবে লেখক এ শবদটিকে আরও বযাপক অর্থে বযবহার করেছেন।
তিনি ইসলামি তাসাওউর বলতে বুঝিয়েছেন কুরআন ও সুন্নাহ থেকে পাওয়া অস্তিত্বের সামগ্রিক বযাখযাকে। যে বযাখযার মধেয স্রষ্টা, সৃষ্টিজগৎ, মানুষের উৎস ও ভূমিকা, জীবনের উদ্দেশ্য, নৈতিকতা, সমাজ, শাসন—সবই অন্তর্ভুক্ত।
লেখক যে অর্থে তাসাওউর শবদটি বযবহার করেছেন অর্থের দিক থেকে 'ধারণা', 'দৃষ্টিভঙ্গি' ইৎযাদি শবেদর তুলনায় ইংরেজি ওর্য়ান্ডভিউ (worldview) শবদটি তার সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। দুঃখজনকভাবে ওর্য়ান্ডভিউ শবেদর যেসব বাংলা করা হয়েছে, সেগুলো হয় অৎযন্ত অপ্রচলিত হবার কারণে অচেনা প্রায়, অথবা মূলভাব প্রকাশে বর্যথ কিংবা দুটোই। তাই অনুবাদে 'ওর্য়ান্ডভিউ' শবদটিই বযবহার করা হয়েছে।
সংকেষপে ওর্য়ান্ডভিউ হলো :
স্রষ্টা, মহাবিশ্ব, মানুষ, ইতিহাস, জীবনমৃৎযু, জ্ঞানসহ নানা বিষয়ে মৌলিক বিশ্বাসের সমষ্টি। এটি চিন্তার ওই কাঠামো, যার সাপেকেষ, যার মাধযমে এবং যার ভেতরে মানুষ বাস্তবতাকে বোঝার ও বযাখযা করার চেষ্টা করে। ওর্য়ান্ডভিউ হলো ওই লেন্স, ওই চশমা, যার ভেতর দিয়ে আমরা পৃথিবীকে দেখি। প্রৎযেকের যেমন নিজস্ব ভাষা থাকে, তেমনিভাবে প্রৎযেকের একটা ওর্য়ান্ডভিউ থাকো হয়তো তারা সেটাকে 'ওর্য়ান্ডভিউ'-এর মতো গালভরা কোনো শবদ হিসেবে চেনে না, কিন্তু শবেদর পেছনের জিনিসটা কমবেশি সবার মধেযই থাকে।]

> আপনার পূর্বে আমরা যে রাসূলকেই প্রেরণ করেছি, তার কাছে এ ওহি পাঠিয়েছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা আমরাই ইবাদাত করো। (সূরা আম্বিয়া, ২১ : ২৫)

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান—মহান আল্লাহর একত্ব, বা তাওহীদ। এটি ইসলামি আকীদার মৌলিক শিক্ষা এবং ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। দুনিয়াতে আজ যত ধর্ম, দর্শন এবং বিশ্বাস আছে, তার মধ্যে কেবল ইসলামকেই বিশুদ্ধ একত্ববাদ বলা চলে। এ কারণেই আমরা তাওহীদ বা মহান আল্লাহর একত্ববাদের শিক্ষাকে ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছি।

প্রথমেই একটি বিষয় স্পষ্ট করা দরকার। সব নবি-রাসূলের শিক্ষার মূল এবং প্রধান উপাদান ছিল—তাওহীদ বা মহান আল্লাহর একত্ববাদের শিক্ষা। ইসলাম অর্থ : এক আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা, শুধু তাঁরই নির্দেশিত পথের অনুসরণ করা। বিশ্বাস ও নৈতিক আচরণের নির্দেশনা গ্রহণ করা কেবল তাঁরই কাছ থেকে। নিজের নিয়তকে এবং ইবাদাতকে এক আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করা। তাঁর আদেশ ও বিধান বাস্তবায়ন করা মানবজীবনে এবং ইবাদাতে।

প্রত্যেক নবি-রাসূল এই শিক্ষা নিয়েই এসেছিলেন, আলাইহিমুস সালাম। কিন্তু পূর্ববর্তী রাসূলগণ চলে যাবার পর তাঁদের শিক্ষার মাঝে প্রবেশ করানো হয় বিভিন্ন বিকৃতি ও বিচ্যুতি। বিকৃতির এই ধারা চলতে চলতে আজ আমরা এমন এক অবস্থায় এসে পৌঁছেছি, যখন আগেকার নবিদের রেখে যাওয়া শিক্ষার বিশুদ্ধ রূপ পৃথিবীতে আর অবশিষ্ট নেই। আজ এই পৃথিবীতে থাকা একমাত্র বিশুদ্ধ শিক্ষা হলো নবি মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আনীত শিক্ষা। মহান আল্লাহ স্বয়ং এ দ্বীনকে বিচ্যুতি ও কলুষতা থেকে রক্ষা করেছেন। মহান আল্লাহর একত্বের শিক্ষা ইসলামি আকীদা এবং ওয়ার্ল্ডভিউয়ের অনন্য বৈশিষ্ট্য।

তাওহীদকে ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেব নির্দিষ্ট করার আরেকটি কারণ আছে। ইসলামি বিশ্বাস এবং আচরণের সবকিছুকে ঘিরে আছে মহান আল্লাহর একত্বের শিক্ষা। নৈতিকতা, আচরণ, সমাজে মানুষের সাথে লেনদেন—সবকিছু কোনো না কোনোভাবে তাওহীদের শিক্ষার সাথে যুক্ত।

মহাবিশ্বে যা কিছু ঘটে, যা কিছু সত্য ও বাস্তব, মানুষের জীবনে এবং মানবসমাজে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন শক্তিসহ সবকিছুর ব্যাপারে একজন মুসলিমের ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ন্ত্রিত হয় মহান আল্লাহর একত্বের ওপর তার দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমে। এই বিশ্বাস মুসলিমের জীবনের ছোটবড়, প্রকাশ্য ও গোপনীয়, বিশ্বাস ও আচরণ, বিধান ও উপাসনা, প্রতিটি ক্ষেত্রে কার্যকর থাকে। ইসলামি জীবনব্যবস্থার এমন কোনো উপাদান নেই, যা এই সর্বব্যাপী তাওহীদের বিশ্বাসের বাইরে। 'ব্যাপকতা' অধ্যায়ে এ বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি।

ইসলামের ভিত্তি হিসেবে যেসব মূলনীতি আছে তার মধ্যে একটি হলো—মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি থেকে পৃথক এবং উলুহিয়াত কেবল মহান আল্লাহর বৈশিষ্ট্য; অর্থাৎ শুধু তিনিই ইবাদাত পাবার যোগ্য। এতে তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি স্রষ্টা, বাকি সবাই এবং সবকিছু তাঁর সৃষ্টি। যেহেতু মহান আল্লাহ একমাত্র সত্য ইলাহ, তাই ইলাহি সব বৈশিষ্ট্য শুধুই তাঁর। যেহেতু বাকি সবকিছু তাঁর সৃষ্টি, তাই তিনি ছাড়া আর কারও মাঝে ঐশ্বরিক কোনো বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে না। কাজেই অস্তিত্বের দুটো ধরন আছে—একটি হলো মহান আল্লাহর স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও অমুখাপেক্ষী অস্তিত্ব। আরেকটি হলো তাঁর সৃষ্টির অস্তিত্ব। মহান আল্লাহ আস-সামাদ, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন, আমরা সবাই তার মুখাপেক্ষী। মহান আল্লাহর সাথে সবার ও সবকিছুর সম্পর্ক হলো—: তিনি মালিক, আমরা তাঁর গোলাম।

এ কারণেই তাওহীদ ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। যেমনটা একটু আগে বলেছি, সব নবি-রাসূল (আলাইহিমুস সালাম) তাওহীদের শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন। আল্লাহ প্রদত্ত সব জীবনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ছিল তাওহীদ। এই দাবি আমরা কুরআন থেকেই করছি। পূর্ববর্তী রাসূলগণের ব্যাপারে কুরআনে আল্লাহ আমাদের বলেছেন,

আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠিয়েছিলাম। অতঃপর তিনি বলেছিলেন, 'হে আমার সম্প্রদায়!- আল্লাহর ইবাদাত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই। নিশ্চয় আমি তোমাদের ওপর মহা দিবসের শাস্তির আশঙ্কা করছি।' (সূরা আ'রাফ, ৭ : ৫৯)

আর আদ জাতির কাছে (পাঠিয়েছিলাম) তাদের ভাই হূদকে। তিনি বলেছিলেন, 'হে আমার সম্প্রদায়!- তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই। তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে না?' (সূরা আ'রাফ, ৭ : ৬৫)

আমি সামূদ জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম তাদের ভাই সালিহকে। তিনি বলেছিলেন, 'হে আমার সম্প্রদায়!- তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই। অবশ্যই তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে...' (সূরা আ'রাফ, ৭ : ৭৩)

আর মাদইয়ানবাসীদের নিকট তাদের ভাই শুআইবকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'হে আমার সম্প্রদায়-! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই; তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে স্পষ্ট প্রমাণ।' (সূরা আ'রাফ, ৭ : ৮৫)

আর মূসার বৃত্তান্ত আপনার কাছে পৌঁছেছে কি? তিনি যখন আগুন দেখলেন (মাদইয়ান থেকে মিসর যাবার পথে), তখন তার পরিবারবর্গকে বললেন, 'তোমরা এখানে অবস্থান করো, আমি আগুন দেখেছি, সম্ভবত আমি তোমাদের জন্য তা থেকে কিছু জ্বলন্ত অঙ্গার আনতে পারব অথবা আমি আগুনের কাছেধারে কোনো পথনির্দেশ পাব।

তারপর যখন তিনি আগুনের কাছে আসলেন, তখন তাকে আহ্বান করা হলো, 'হে মূসা!- নিশ্চয় আমি আপনার রব, সুতরাং আপনার জুতা জোড়া খুলে ফেলুন, আপনি পবিত্র 'তুওয়া' উপত্যকায় রয়েছেন। আমি আপনাকে মনোনীত করেছি। অতএব যা ওহিরূপে পাঠানো হচ্ছে, আপনি তা মনোযোগের সাথে শুনুন। নিশ্চয় আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই; সুতরাং আমার ইবাদাত করুন এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম করুন।' (সূরা ত্বহা, ২০ : ৯-১৪)

আরও স্মরণ করুন, আল্লাহ যখন বলবেন, 'হে মারইয়াম তনয় ঈসা!- আপনি কি লোকদেরকে বলেছিলেন, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আমাকে ও আমার জননীকে দুই ইলাহরূপে গ্রহণ করো?'

তিনি বলবেন, 'আপনিই মহিমান্বিত! যা বলার অধিকার আমার নেই, তা বলা আমার পক্ষে শোভনীয় নয়। যদি আমি তা বলতাম, তবে আপনি তো তা জানতেন। আমার অন্তরের কথা তো আপনি জানেন, কিন্তু আপনার অন্তরের কথা আমি জানি না; নিশ্চয় আপনি অদৃশ্য সম্বন্ধে সবচেয়ে ভালো জানেন। আপনি আমাকে যে আদেশ করেছেন, তা ছাড়া তাদেরকে আমি কিছুই বলিনি এবং তা এই যে, তোমরা আমার রব ও তোমাদের রব আল্লাহর ইবাদাত করো এবং যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি ছিলাম তাদের কাজকর্মের সাক্ষী; কিন্তু যখন আপনি আমাকে তুলে নিলেন, তখন আপনিই তো ছিলেন তাদের কাজকর্মের তত্ত্বাবধায়ক এবং আপনিই সব বিষয়ে সাক্ষী।

> আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন তবে তারা তো আপনারই বান্দা। আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' (সূরা মায়িদা, ৫ : ১১৬-১১৮)

> আপনার পূর্বে আমরা যে রাসূলকেই প্রেরণ করেছি, তার কাছে এ ওহি পাঠিয়েছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই, সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত করো। (সূরা আম্বিয়া, ২১ : ২৫)

কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় মানবরচিত বিভিন্ন বিশ্বাস ও ব্যাখ্যার সংমিশ্রণে রাসূলগণের আনা তাওহীদের শিক্ষা বিকৃত হয়ে গেল। 'চিন্তার মরুপ্রান্তর ও ধ্বংসস্তূপ' অধ্যায়ে এই বিষয়টি নিয়ে আমরা মোটামুটি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা দেখিয়েছি ইয়াহূদি এবং খ্রিষ্টধর্ম কীভাবে বিকৃত হয়েছে, এছাড়া বিভিন্ন পৌত্তলিক ধর্ম ও দর্শনের কথাও আমরা আলোচনা করেছি।

তাওহীদের গুরুত্ব এবং তাওহীদের বিশ্বাস কীভাবে ব্যক্তি মুসলিম ও মুসলিম সমাজের প্রতিটি দিককে প্রভাবিত করে, সে আলোচনায় যাবার আগে অন্যান্য বিশ্বাস ও দর্শনে সার্বভৌমত্ব ও গোলামি, স্রষ্টা ও সৃষ্টি নিয়ে কীভাবে আলোচনা এসেছে সেগুলো দেখে নেওয়া যাক :

হিন্দু ধর্ম একক অস্তিত্বমান সত্তার কথা বলে—ব্রহ্মা। হিন্দু ধর্ম বলে প্রকৃত অর্থে অস্তিত্ব আছে শুধু দেবতা ব্রহ্মার। ব্রহ্মার আছে পরিপূর্ণতা, অমরত্ব এবং সর্বময় কল্যাণের বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্যগুলো শুধু তারই। ব্রহ্মা ছাড়া বাকি সবকিছু প্রকৃত অর্থে নাস্তি, অস্তিত্বহীন। অন্যদিকে হিন্দু ধর্মই আবার বলে ব্রহ্মার বিভিন্ন অবতারের কথা। দেবতা ব্রহ্মা পুরোপুরিভাবে উত্তম এবং প্রকৃত অর্থে একমাত্র অস্তিত্বমান সত্তা হলেও বিভিন্ন অনস্তিত্বমান জীবের সাথে সে মিশে যায়। তাই প্রতিটি জিনিস আসলে অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের মিশ্রণ। ভালোমন্দ, ত্রুটি-পরিপূর্ণতা, স্থায়িত্ব ও সাময়িকতার মিশ্রণ।

একজন হিন্দুকে ক্রমাগত চেষ্টা করতে হবে তার ভেতরে থাকা অস্তিত্ব, পরিপূর্ণতা, কল্যাণ এবং চিরন্তনের অংশকে তার ভেতরে থাকা অনস্তিত্ব, ত্রুটি ও নশ্বরতা থেকে মুক্ত করার। এই মুক্তিকে বলা হয় 'নির্বাণ'। অর্থাৎ নশ্বরতা থেকে মুক্তি, মোক্ষ। শরীর আর জগৎসংসারের খাঁচা থেকে সত্তাকে মুক্ত করা। নাস্তি থেকে মুক্ত হয়ে পরম সত্তা ব্রহ্মার পর্যায়ে ফেরত যাওয়া। কাজেই হিন্দু ধর্ম এক ধরনের একত্ববাদের কথা বলে আবার সংমিশ্রণবাদের কথাও বলে।

এছাড়া হিন্দু ধর্মের মধ্যে এক ধরনের ত্রিত্ববাদের শিক্ষাও আছে—দেবতা ব্রহ্মা হলো স্রষ্টা, দেবতা বিষ্ণু জীবনদানকারী আর দেবতা শিব হলো ধ্বংসকারী। আবার হিন্দু ধর্মমতে মহাবিশ্ব এবং দেবতাদের ওপরেও রাজত্ব করে 'কর্ম' বা নিয়তি। কর্মই জন্ম ও পুনর্জন্মের চক্রকে নিয়ন্ত্রণ করে। অস্তিত্বের চক্র সৃষ্টি এবং এর পুনরাবৃত্তি করে কর্ম। তাই একদিকে হিন্দু ধর্মে বিভিন্ন দেবতার ধারণা আছে, অন্যদিকে আছে কর্ম নামের এই শক্তির ধারণাও, যে শক্তি মহাবিশ্ব, মানুষ এবং দেবতাদের ওপরও রাজ করে। এর সাথে আছে আরও অগণিত দেবদেবী, নানা নামে যাদের ইবাদাত করা হয়। এধরনের নানামুখী বিশ্বাসের কারণে হিন্দু ধর্ম থেকে একত্ববাদের শিক্ষা একেবারে হারিয়ে গেছে। একত্ববাদের ছিটেফোঁটাও আর এতে বাকি নেই।

মিশরের এক ফিরআউনের নাম ছিল আখেনাতেন।[1] সে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করত। এই ঈশ্বরের নাম ছিল 'আতেন'। আখেনাতেন মনে করত আতেন হলো মহাবিশ্বের স্রষ্টা এবং শাসক। মানবরচিত ধারণাগুলোর মধ্যে আখেনাতেনের এই স্রষ্টার ধারণাকে

তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে ভালো বলা যায়। হতে পারে, আখেনাতেন কোনো রাসূলের শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত ছিল-; আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। কিন্তু তার এই ধারণার মধ্যেও পৌত্তলিকতার কিছু প্রভাব ছিল। আখেনাতেন মনে করত, আতেনের প্রতিনিধিত্ব করে সূর্য। এভাবে সে মহান আল্লাহর একত্বের ধারণার বিশুদ্ধতাকে পৌত্তলিকতার সাথে মিশিয়ে কলুষিত করেছিল।

গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের মতে ঈশ্বর বা 'প্রথম কারণ' কোনোকিছু সৃষ্টি করে না। তবে ঈশ্বর হলো মহাবিশ্বের অস্তিত্ব ও গতির জন্য প্রয়োজনীয় সত্তা। এই ঈশ্বর সব ধরনের ইচ্ছা এবং ক্রিয়া থেকে মুক্ত। মহাবিশ্ব নিয়ে তিনি চিন্তিত নন। আরেক দার্শনিক প্লটিনসের মতে ঈশ্বর হলো পরম একক, তার থেকে বুদ্ধিমত্তা নামে আরেক সত্তা বিচ্ছুরিত হয়, বুদ্ধিমত্তা থেকে আত্মা নামের তৃতীয় এক সত্তা, আর আত্মাই মহাবিশ্বের স্রষ্টা।

আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস ছিল ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর পথ। এই শিক্ষাই তিনি দিয়ে গেছেন তাঁর পুত্র ইসমাঈল এবং ইসহাককে। ইসহাকের পুত্র ইয়া'কূবও ছিলেন মহান আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী। তিনিও তাঁর সন্তানদের তাওহীদের শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ তাঁদের সকলের ওপর শান্তি বর্ষণ করুন। মৃত্যুর সময় সন্তানদের ইয়া'কূব (আলাইহিস সালাম) কী বলে গেছেন, কুরআন আমাদের তা জানায়,

> যে নিজেকে নির্বোধ বানিয়েছে, সে ছাড়া আর কে ইবরাহীমের পথ থেকে বিমুখ হতে পারে? দুনিয়াতে তাকে আমরা মনোনীত করেছি; আর আখিরাতেও তিনি অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্যতম। স্মরণ করুন, যখন তার রব তাকে বলেছিলেন, 'আত্মসমর্পণ করুন', তিনি বলেছিলেন, 'আমি সৃষ্টিকুলের রবের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম।' আর এ বিষয়ে ইবরাহীম ও ইয়া'কূব স্বীয় পুত্রদেরকে অন্তিম উপদেশ দান করে গেছেন, 'আমার সন্তানেরা!- আল্লাহ এ দ্বীনকে তোমাদের জন্য পছন্দ করেছেন; কাজেই তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।'
>
> ইয়া'কূবের যখন মৃত্যু এসেছিল, তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? তিনি যখন সন্তানদের বলেছিলেন, 'আমার পরে তোমরা কার ইবাদাত করবে?' তারা উত্তর দিয়েছিল, 'আমরা আপনার এবং আপনার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্যের উপাসনা করব, যিনি অদ্বিতীয় উপাস্য এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পিত।' (সূরা বাকারা, ২ : ১৩০-১৩৩)

মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে যখন বনী ইসরাঈলের কাছে রাসূল হিসেবে পাঠানো হলো, তিনি সেই একই তাওহীদের শিক্ষা নিয়েই আসলেন। কিন্তু মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর সালামের আগমনের আগে এবং তাঁর ইন্তেকালের পরেও বনী ইসরাঈল বারবার তাওহীদের শিক্ষাকে কলুষিত করেছে। তারা শব্দগুলোর প্রকৃত অর্থ বদলে ফেলেছে, আর নবিগণের শিক্ষাকে দূষিত করে মহান আল্লাহকে পরিণত করেছে তাদের গোত্রীয় দেবতায়। পাশাপাশি তারা আল্লাহর ব্যাপারে অসংখ্য মিথ্যারোপ করেছে।

যেমন: বনী ইসরাঈল দাবি করেছে—-তারা মহান আল্লাহর সন্তান, আল্লাহ তাদেরকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। তারা গুনাহ করলেও আল্লাহ তাদের শাস্তি দেবেন না। তারা বলেছে, উযাইর (আলাইহিস সালাম) ছিলেন মহান আল্লাহর সন্তান। তারা বলেছে, মহান আল্লাহর পুত্র আছে, যারা মানুষের কন্যাদের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছে। তাদের মিলনে দানবাকৃতির নেফিলীমদের জন্ম হয়।[2] ব্যাবিলনের মিনার তৈরি হবার সময় ঈশ্বর নাকি ভয় পাচ্ছিলেন। সব মানুষ যদি এক ভাষায় কথা বলে, এক সাথে কাজ

করে, তাহলে কিছুই তাদের অসাধ্য থাকবে না। তাই ঈশ্বর মানুষদের বিভিন্ন ভাষায় বিভক্ত করে দিলেন। মানুষ বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে শুরু করল এবং তাদের মধ্যকার ঐক্য নষ্ট হয়ে গেল।[3]

তারা আরও দাবি করত, ইয়া'কূব (আলাইহিস সালাম) ঈশ্বরের সাথে কুস্তি লড়াই করেছিলেন।[4] তারা দাবি করে, ঈশ্বর বাগানের ছায়ায় হাঁটেন, শীতের শীতলতা উপভোগ করেন, গন্ধ পছন্দ করেন ভাজা মাংসের।[5] এধরনের আরও অনেক কথা তারা বলে। আমরা এই জঘন্য মিথ্যাচার থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। নিশ্চয় তারা যা বলে, মহান আল্লাহ তা থেকে পবিত্র। এই ধরনের কুৎসিত গালগল্প তাদের কাছে আসা তাওহীদের বিশুদ্ধ শিক্ষাকে কলুষিত করে ফেলেছে।

তাওহীদের শিক্ষা নিয়ে ঈসা (আলাইহিস সালাম)-ও এসেছিলেন। কিন্তু খ্রিষ্টানরা তাওহীদ বাদ দিয়ে ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করতে শুরু করল। দাবি করল, ঈশ্বর তিনটি ব্যক্তিসত্তায় বিভক্ত। আজও তারা দাবি করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব তিনটি ব্যক্তিতে বিভক্ত—পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা। এই তিনের মধ্যে পুত্রের প্রকৃতি আসলে কী, তা নিয়ে খ্রিষ্টানদের বিভিন্ন ফিরকার মধ্যেই নানা তর্ক আছে। এ ধরনের ধ্যানধারণা এবং ব্যাখ্যা প্রমাণ করে দেয় যে, তাদের একত্ববাদে বিশ্বাসের দাবি একেবারেই ভুল।

কাজেই আমরা নিশ্চিতভাবে এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে পারি ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউই একমাত্র ওয়ার্ল্ডভিউ, যা পূর্ণ ও বিশুদ্ধ তাওহীদের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীতে যত ধরনের বিশ্বাস আর দর্শন আছে, তার মধ্যে কেবল ইসলামেরই এই বৈশিষ্ট্য আছে। এবার আসুন ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ অনুযায়ী মহান আল্লাহর একত্বের শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করা যাক—

তাওহীদের শিক্ষা : ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ তাওহীদের পবিত্র শিক্ষার ভিত্তির ওপর গঠিত। ইসলাম আমাদের শেখায়, মহান আল্লাহ সত্য। তিনি ছাড়া অন্য সবকিছু তাঁর সৃষ্টি, তাঁর গোলাম। ইবাদাত কেবল তাঁরই জন্য। প্রত্যেকটি ইলাহি বৈশিষ্ট্য কেবল আল্লাহরই। মানুষ কিংবা অন্য কোনো সৃষ্টির পক্ষে এই বৈশিষ্ট্যগুলো ধারণ করা সম্ভব নয়।

> বলুন, 'তিনি আল্লাহ, এক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।' (সূরা ইখলাস, ১১২ : ১-৪)
>
> ...কোনোকিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সূরা শূরা, ৪২ : ১১)
>
> ...কাজেই তোমরা আল্লাহর কোনো সদৃশ স্থির করো না। (সূরা নাহ্ল, ১৬ : ৭৪)
>
> ...আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুর তত্ত্বাবধায়ক। (সূরা যুমার, ৩৯ : ৬২)
>
> ...তিনিই তো আল্লাহ, তোমাদের রব; তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা; কাজেই তোমরা তাঁর ইবাদাত করো; তিনি সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক। (সূরা আনআম, ৬ : ১০২)
>
> ...তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তা নির্ধারণ করেছেন যথাযথ অনুপাতে। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ২)

বলুন, ‘তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো, আমাকে দেখাও তো তারা জমিনে কী সৃষ্টি করেছে অথবা আসমানসমূহে তাদের কোনো অংশীদারত্ব আছে কি না? এ ব্যাপারে পূর্ববতী কোনো কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোনো জ্ঞান (তোমাদের) থাকলে তা তোমরা আমার কাছে নিয়ে আসো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।’ (সূরা আহকাফ, ৪৬ : ৪)

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর মালিক :

বলুন, ‘আসমানসমূহ ও জমিনে যা আছে, তা কার?’ বলুন, ‘আল্লাহরই’, তিনি তাঁর নিজের ওপর দয়া করা লিখে নিয়েছেন। (সূরা আনআম, ৬ : ১২)

আসমানসমূহ, জমিন ও তাদের মধ্যবর্তী যা রয়েছে, তার রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছে, সৃষ্টি করেন। আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা মায়িদা, ৫ : ১৭)

মহা কল্যাণময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দার ওপর সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী (ফুরকান) নাযিল করেছেন, যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে। যিনি আসমানসমূহ ও জমিনের সার্বভৌমত্বের অধিকারী; তিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি; সার্বভৌমত্বে তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তা নির্ধারণ করেছেন যথাযথ অনুপাতে। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ২-৩)

আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলা রিয্কদাতা :

হে মানুষ!- তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো। তিনি ছাড়া কোনো সৃষ্টিকর্তা আছে কি, যে তোমাদেরকে আসমান ও জমিন থেকে রিয্ক দেবে? তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই, তাহলে কীভাবে তোমরা বিপথগামী হচ্ছ? (সূরা ফাতির, ৩৫ : ৩)

আর এমন কত জীবজন্তু রয়েছে, যারা নিজেদের খাদ্য মজুদ রাখে না, আল্লাহই তাদেরকে রিয্ক দান করেন আর তোমাদেরকেও। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা, আনকাবূত, ২৯ : ৬০)

জমিনে বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণীর রিযেকের দায়িত্ব আল্লাহরই এবং তিনি জানেন তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি। সবকিছুই আছে স্পষ্ট কিতাবে। (সূরা হূদ, ১১ : ৬)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সকল কিছুর অভিভাবক, কর্মবিধায়ক :

নিশ্চয় আল্লাহ আসমানসমূহ ও জমিনকে ধারণ করেন, যাতে তারা স্থানচ্যুত না হয়। আর যদি তারা স্থানচ্যুত হয়, তাহলে তিনি ছাড়া আর কে আছে, যে এগুলোকে ধরে রাখবে? নিশ্চয় তিনি পরম সহনশীল, অসীম ক্ষমাপরায়ণ। (সূরা ফাতির, ৩৫ : ৪১)

আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে, আসমান ও জমিন স্থিতিশীল থাকে তাঁরই নির্দেশে... (সূরা রূম, ৩০ : ২৫)

সবকিছুই আমি সংরক্ষিত রেখেছি স্পষ্ট কিতাবে...(সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ১২)

আল্লাহ সার্বভৌম, তিনি সবকিছুর ওপর শক্তিশালী :

তিনি তাঁর বান্দাদের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্বশীল, আর তিনি তোমাদের ওপর রক্ষক নিযুক্ত করেন। অতঃপর তোমাদের কারও মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে আমার প্রেরিত দূতগণ তার মৃত্যু ঘটায়। তারা কোনো ত্রুটি করে না। তারপর তাদেরকে প্রকৃত রব আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে। জেনে রাখুন, হুকুম তো তাঁরই এবং তিনি সবচেয়ে দ্রুত হিসেব গ্রহণকারী। (সূরা আনআম, ৬ : ৬১-৬২)

বলুন, ‘তিনি তো সক্ষম তোমাদের ওপর থেকে অথবা তোমাদের পায়ের নিচ থেকে আযাব প্রেরণ করতে অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন সন্দেহপূর্ণ দলে বিভক্ত করতে এবং তোমাদের একদলকে অন্য দলের আক্রমণের স্বাদ আস্বাদন করাতে।’ (সূরা আনআম, ৬ : ৬৫)

(হে রাসূল!) বলুন, ‘তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ যদি তোমাদের শ্রবণশক্তি আর দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেন আর তোমাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেন, তাহলে আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ আছে, যে সেগুলো তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেবে? (সূরা আনআম, ৬ : ৪৬)

সব সৃষ্টি আল্লাহর আনুগত্য করে আত্মসমর্পণ ও দাসত্বের সাথে :

তারপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করলেন, যা (পূর্বে) ছিল ধোঁয়া। অতঃপর তিনি আসমান ও জমিনকে বললেন, ‘তোমরা উভয়ে এসো ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়।’ তারা বলল, ‘আমরা আসলাম অনুগত হয়ে।’ (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ১১)

আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে, আসমান ও জমিন স্থিতিশীল থাকে তাঁরই নির্দেশে। তারপর তিনি যখন তোমাদেরকে জমিন থেকে বের হয়ে আসার জন্য একবার আহ্বান করবেন, তখনই তোমরা বের হয়ে আসবে। আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে, সব তাঁরই। সবকিছু তাঁরই অনুগত। (সূরা রূম, ৩০ : ২৫-২৬)

আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যত জীবজন্তু ও ফেরেশতারা, সমস্তই আল্লাহকে সাজদা করে; তারা অহংকার করে না। (সূরা নাহ্‌ল, ১৬ : ৪৯)

সাত আসমান এবং জমিন এবং এগুলোর অন্তর্বর্তী সবকিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই, যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না; কিন্তু তাঁদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা বুঝতে পারো না; নিশ্চয় তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ। (সূরা ইসরা, ১৭ : ৪৪)

তাওহীদের ধারণা বোঝার জন্য কুরআনের এ আয়াতগুলো যথেষ্ট হবার কথা। লক্ষ করবেন, কুরআনে স্রষ্টা এবং সৃষ্টির আলাদা হবার বিষয়টির ওপর বারবার জোর দেওয়া হয়েছে। বারবার বলা হয়েছে, মহান আল্লাহর সামনে সৃষ্টির কেবল একটিই পরিচয় হতে পারে—দাস। রবের সাথে বান্দার সম্পর্কের ভিত্তি হলো বান্দার দাসত্ব। এ সম্পর্কের ভিত্তি বংশ পরিচয়, আত্মীয়তা, অংশীদারত্ব, সম্পদ, সাদৃশ্য কিংবা এরকম অন্য কিছু হতে পারে না। এমন সম্পর্ক মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

তাওহীদের বিশ্বাস কত গভীর ও সুদূরপ্রসারীভাবে জীবনকে প্রভাবিত করে, তা নিয়ে কিছু কথা না বললে এ আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এ প্রভাবগুলো আসলে তাওহীদের শিক্ষার বাস্তব প্রতিফলন এবং এগুলো প্রমাণ করে—তাওহীদই হলো ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

তাওহীদের শিক্ষা বলে, মহান আল্লাহ কেবল আকীদা, ওয়ার্ল্ডভিউ, নৈতিকতা, ইবাদাত ও আচার-অনুষ্ঠানের মালিক নন, বরং দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রেও তিনি এককভাবে সার্বভৌম। একত্ববাদে বিশ্বাসের অর্থ, মানুষের জীবনের ওপর নিয়ন্ত্রণ শুধু এক সর্বশক্তিমান সত্তার। একজন মুসলিম বিশ্বাস করে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, তিনি ছাড়া আর কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই, নেই কোনো রিয্‌কদাতা। আল্লাহ ছাড়া কেউ উপকার কিংবা ক্ষতি করতে সক্ষম নয়। মহাবিশ্ব এবং মানুষের জীবনের ওপর নেই মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারও কর্তৃত্ব। মুসলিম কেবল আল্লাহর ইবাদাত করে। ভয় এবং আশা নিয়ে আন্তরিকভাবে সে কেবল আল্লাহর সামনে মাথা নত করে।

একইভাবে একজন মুসলিম বিশ্বাস করে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের আর কোনো শাসক নেই। আর কোনো সার্বভৌম সত্তা নেই। আর কোনো বিধানদাতা নেই। আল্লাহ ছাড়া আর কারও এখতিয়ার নেই মহাবিশ্ব, প্রাণিজগৎ এবং অন্য মানুষের ব্যাপারে দিকনির্দেশনা দেওয়ার। এ জন্যই জীবনের সব ক্ষেত্রে নির্দেশনা এবং বিধানের জন্য একজন মুসলিম আল্লাহর দ্বারস্থ হয়—হোক সেটা বিচার, শাসন, অর্থনীতি, রাজনীতি, ব্যক্তিগত আচার-আচরণ কিংবা সামাজিক নিয়মনীতি ও সংস্কার।

মানবজীবনে তাওহীদের প্রভাবের বিষয়টি কুরআনে আলোচিত হয়েছে। মহাবিশ্ব এবং প্রত্যেক মানুষের জীবনের ওপর মহান আল্লাহর একক সার্বভৌমত্বের বিশ্বাস মুসলিমের জন্য বেশ কিছু দায়িত্ব নিয়ে আসে। এই দায়িত্বগুলো একাধারে বুদ্ধিবৃত্তিক, আত্মিক, মানসিক এবং প্রায়োগিক। কুরআনের আলোচনাতে মহাবিশ্বের আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রভাব এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুসরণের আবশ্যকতার উল্লেখ আমরা পাই একই সূত্রে। আল্লাহ বলেছেন,

> আর তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ। তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।
>
> নিশ্চয় আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের পরিবর্তনে, মানুষের উপকারী দ্রব্যবাহী চলমান সামুদ্রিক জাহাজে এবং আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেছেন, তার মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন সকল প্রকার বিচরণশীল প্রাণী এবং বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে বিবেকবান কওমের জন্য নিদর্শনসমূহ রয়েছে।
>
> আর মানুষের মধ্যে কোনো কোনো লোক এমনও আছে, যে অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, আল্লাহকে

ভালোবাসার মতো তাদেরকে ভালোবাসে। আর যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহকে সর্বাধিক ভালোবাসে। যারা জুলুম করেছে, যদি তারা আযাব দেখতে পেত, (তবে তারা নিশ্চিত হতো যে,) সমস্ত শক্তি আল্লাহরই। আর নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর। (সেই দিন) যাদেরকে অনুসরণ করা হতো, তারা অনুসরণকারীদের সঙ্গে সম্পর্কের কথা অস্বীকার করবে, তারা আযাব দেখতে পাবে আর তাদের মধ্যেকার যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। আর যারা অনুসরণ করেছিল, তারা বলবে, 'হায়! যদি একবার আমাদের ফিরে যাওয়ার সুযোগ হতো, তাহলে আমরাও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, যেমনভাবে তারা সম্পর্ক ছিন্ন করল।' এভাবে আল্লাহ তাদেরকে তাদের আমলসমূহ দেখাবেন তাদের জন্য আক্ষেপস্বরূপ। আর তারা আগুন থেকে বের হতে পারবে না।

হে মানুষ!; তোমরা খাও জমিনে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে, তা থেকে। আর তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। নিশ্চয় সে তোমাদেরকে আদেশ দেয় মন্দ ও অশ্লীল কাজের এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন সব বিষয় বলার, যা তোমরা জানো না। আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তা তোমরা অনুসরণ করো', তারা বলে, 'না, বরং আমরা তারই ওপর চলব, যার ওপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি।' যদিও তাদের পিতৃপুরুষরা কিছু বুঝত না এবং তারা সৎপথেও পরিচালিত ছিল না, তবুও কি? আর যারা কুফরি করেছে, তাদের উদাহরণ তার মতো, যে এমন কিছুর জন্য চিৎকার করছে, হাঁক-ডাক ছাড়া যে কিছু শোনে না। তারা বধির, বোবা, অন্ধ। তাই তারা বোঝে না।

হে মুমিনগণ;! আহার করো আমি তোমাদেরকে যে হালাল রিয্ক দিয়েছি, তা থেকে এবং আল্লাহর শোকর করো, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদাত করো। নিশ্চয় তিনি তোমাদের ওপর হারাম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত এবং যার ওপর আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারিত হয়েছে, তবে যে ব্যক্তি নিরুপায় হয়ে পড়ে কিন্তু সে নাফরমান ও সীমালঙ্ঘনকারী নয়, তার ওপর কোনো গুনাহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা বাকারা, ২ : ১৬৩-১৭৩)

এখানে প্রথমে আল্লাহ তাওহীদের কথা বলেছেন, তারপর ওই সব প্রাকৃতিক ঘটনার কথা বলেছেন, যেগুলোর মাধ্যমে তার ক্ষমতা প্রকাশ পায়। তারপর তিনি বর্ণনা দিয়েছেন বিচারের দিনের, যা সার্বভৌমত্ব এবং বিচারের ক্ষেত্রে তাঁর একক কর্তৃত্বকে প্রকাশ করে। পরের আয়াতগুলোতে তিনি বিভিন্ন হালাল ও হারাম জিনিসের কথা আলোচনা করেছেন। মানুষকে আদেশ করেছেন তাঁর বিধান মেনে চলতে এবং শয়তানের আনুগত্য ও জাহিলিয়াতের প্রথা-প্রচলন অনুসরণ করাকে নিষিদ্ধ করেছেন তিনি। বলেছেন, তিনি যা প্রণয়ন করেছেন, তা ছাড়া আর কোনোকিছু অনুসরণ করা যাবে না। তারপর তিনি বিশ্বাসীদের বলেছেন উত্তম জিনিস থেকে খেতে, যা তিনি হালাল করেছেন। একই সাথে তিনি মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, তারা যেন এক আল্লাহরই ইবাদাত করে এবং হালাল-হারামের ক্ষেত্রে কেবল তাঁরই নির্দেশনা অনুসরণ করে।

কাজেই আল্লাহ একাই হলেন মালিক, তিনি একাই মহাবিশ্বের শাসক। তিনিই বিচারদিনের অধিপতি। শুধু তিনিই ইবাদাতের বিধান দেন, নৈতিকতা নির্ধারণ করেন। বৈধ আর অবৈধ তিনিই ঠিক করেন। ইবাদাত ও আইন; সর্ব ক্ষেত্রে চূড়ান্ত মালিক আল্লাহই।

কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ তাওহীদের অর্থ বর্ণনা করেছেন এবং এর বিভিন্ন তাৎপর্য তুলে ধরেছেন। এমন কিছু আয়াত

আমরা এখানে উল্লেখ করছি। তাওহীদের গভীর অর্থ ও ব্যাপ্তি এ আয়াতগুলোতে ফুটে উঠেছে—

> আর এভাবে আমরা আপনার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি আরবি ভাষায়, যাতে আপনি উম্মুল কুরা (মক্কা) ও তার চারদিকের জনগণকে সতর্ক করতে পারেন; সতর্ক করতে পারেন কিয়ামাতের দিন সম্পর্কে, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। একদল থাকবে জান্নাতে আরেক দল জলন্ত আগুনে।
>
> আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে এক জাতিভুক্ত করতে পারতেন; কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছে, তাকে স্বীয় অনুগ্রহে প্রবেশ করান। আর জালিমদের জন্য কোনো অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই। তারা কি আল্লাহর পরিবর্তে অন্যদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে নিয়েছে? আল্লাহই তো একমাত্র অভিভাবক, তিনিই মৃতকে জীবিত করেন আর তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ করো না কেন—তার ফায়সালা তো আল্লাহরই কাছে। তিনিই আল্লাহ—আমার রব; তাঁরই ওপর আমি নির্ভর করেছি এবং আমি তাঁরই অভিমুখী হই। তিনি আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জোড়া এবং গৃহপালিত জন্তুর মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন জোড়া। এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন; কোনোকিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। তাঁরই কাছে আসমানসমূহ ও জমিনের চাবিকাঠি। তিনি যার জন্য ইচ্ছে, তার রিয্ক বাড়িয়ে দেন এবং সংকুচিত করেন। নিশ্চয় তিনি সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞাত।
>
> তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দ্বীন, যার হুকুম তিনি দিয়েছিলেন নূহকে। আর সেই (বিধিব্যবস্থাই) আপনাকে ওহির মাধ্যমে দিলাম, যার হুকুম দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে। আর তা হলো এই যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং তাতে বিভেদ সৃষ্টি করো না। আপনি মুশরিকদেরকে যার প্রতি ডাকছেন, তা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে, তাঁর দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয়, তাকে তিনি দ্বীনের দিকে হিদায়াত করেন।
>
> মানুষের কাছে ইলম আসার পরও তারা কেবল নিজেদের মধ্যকার বিদ্বেষের কারণে মতভেদ করেছে; পূর্বেই যদি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ফায়সালা মুলতুবি রাখার কথা ঘোষিত না হতো, তাহলে তাদের বিষয় ফায়সালা হয়ে যেত। আর তাদের পর যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে, নিশ্চয় তারা সে সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে। সুতরাং আপনি আহ্বান করুন এবং দৃঢ় থাকুন, যেভাবে আপনি আদিষ্ট হয়েছেন। আর আপনি তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করবেন না এবং বলুন, 'আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন, আমি তাতে ঈমান এনেছি এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে। আল্লাহ আমাদের রব এবং তোমাদেরও রব। আমাদের আমল আমাদের এবং তোমাদের আমল তোমাদের; আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোনো বিবাদ-বিসম্বাদ নেই। আল্লাহ আমাদেরকে একত্র করবেন এবং প্রত্যাবর্তন তারই কাছে।' (সূরা শূরা, ৪৩ : ৭-১৫)

লক্ষ করুন, এখানে শুরুতে ওহি এবং রিসালাতের কথা বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আল্লাহ বলে দিয়েছেন, কিয়ামাতের দিন এবং আখিরাতের বিচারের ব্যাপারে লোকেদের সতর্ক করতে। দুনিয়ার কাজের ভিত্তিতে বিশ্বাসী এবং মন্দকর্মশীলদের আখিরাতে যে ভিন্ন ভিন্ন পরিণতি হবে, একথা জানিয়ে দিতে বলেছেন মানুষকে। তারপর বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ একমাত্র রক্ষাকারী এবং তিনি এককভাবে সবকিছুর ওপর শক্তিশালী। কেবল তাঁরই ক্ষমতা আছে মৃতকে জীবিত করার। উল্লেখ করা

হয়েছে মহান আল্লাহর একক সার্বভৌমত্বের কথা। সত্যিকারের বিশ্বাসীরা কেবল তাঁরই অভিমুখী হয়, কেবল তাঁরই ওপর আস্থা ও বিশ্বাস রাখে।

মহান আল্লাহ তারপর বলেছেন তাঁর সৃষ্টি এবং বস্তুজগতের নানা ঘটনার কথা। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি হওয়া এবং তাদের রিয্ক পাওয়ার দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন তিনি। তারপর মহান আল্লাহ তাঁর যাতের অনন্যতার কথা বলেছেন,

> কোনোকিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা...

বর্ণিত হয়েছে তার সার্বভৌমত্বের অনন্যতাও—

> তাঁরই কাছে আসমানসমূহ ও জমিনের চাবিকাঠি। তিনি যার জন্য ইচ্ছে, তার রিয্ক বাড়িয়ে দেন এবং সংকুচিত করেন...

মহান আল্লাহর যাত, সার্বভৌমত্ব এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের বর্ণনার ঠিক পরেই বলা হচ্ছে, আল্লাহই হলেন একমাত্র বিধানদাতা। একথা কেবল শেষ নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সময়কালের জন্য প্রযোজ্য নয়, বরং প্রযোজ্য পূর্ববর্তী সকল রাসূলগণের ক্ষেত্রেও—

> তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দ্বীন, যার হুকুম তিনি দিয়েছিলেন নূহকে। আর সেই (বিধিব্যবস্থাই) আপনাকে ওহির মাধ্যমে দিলাম, যার হুকুম দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে...

তারপর তিনি মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আদেশ করেছেন মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে ডাকতে এবং এ অবস্থানে দৃঢ় থাকতে। তিনি তাঁর রাসূলকে মানুষের খেয়ালখুশি আর কামনাবাসনা উপেক্ষা করার আদেশ দিয়েছেন। সবশেষে বলা হয়েছে, মানুষের মধ্যে আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর নাযিল করা বিধান দ্বারা বিচার করতে। যারা মহান আল্লাহর নাযিল করা বিধান দ্বারা বিচার ও শাসন করে আর যারা করে না—তাদের মধ্যে এক পূর্ণাঙ্গ বিচ্ছেদ বিদ্যমান। আর বিশ্বাসীদের চূড়ান্ত গন্তব্য হলো আল্লাহর কাছে।

আশা করি মহান আল্লাহর একত্ব এবং সার্বভৌমত্বের শিক্ষার সাথে ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের গভীর সম্পর্কের ব্যাপারে কিছুটা ধারণা এ দুটো উদাহরণ থেকে আপনারা পেয়ে গেছেন এবং বুঝতে পেরেছেন মানবজীবনে তাওহীদের বিশ্বাসের প্রভাব কতটা গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ। এ অধ্যায়ের শুরুতে আমরা দাবি করেছিলাম—একমাত্র ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ-ই তাওহীদের শিক্ষা ধারণ করে এবং এটি এই ওয়ার্ল্ডভিউয়ের সবচেয়ে অনন্য বৈশিষ্ট্য। এই দাবির সত্যতাও আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন।

তাওহীদে বিশ্বাস জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এ শিক্ষা ছাপ ফেলে মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও হৃদয়ে। অন্য কোনো ধারণা মানুষের মন ও মস্তিষ্কে এভাবে প্রভাব ফেলতে পারে না। এ প্রভাব এতটাই শক্তিশালী যে, তা মানুষ ও মানবজাতিকে রূপান্তরিত করে। তাওহীদের বিশ্বাস মানুষের মন ও মস্তিষ্ককে সুশৃঙ্খল করে। তখন মানুষ সময়ের সাথে সাথে পোশাক বদলানোর মতো করে নিজের ওয়ার্ল্ডভিউ, মূল্যবোধ আর নৈতিকতাকে বদলায় না।

যে দৃঢ়ভাবে মহান আল্লাহর ওপর ঈমান আনে, যে নিজেকে আল্লাহর দাস মনে করে, সে জানে তার গন্তব্য, সে চেনে তার নির্ধারিত পথ। সে কে? তার জীবনের উদ্দেশ্য কী? তার সীমাবদ্ধতাগুলো কী—এ প্রশ্নগুলোর উত্তর তার জানা। এই মহাবিশ্ব এবং মহাবিশ্বে যা কিছু আছে, তার প্রকৃতি এবং এর পেছনে কোন শক্তি কাজ করছে, সেই প্রশ্নের উত্তরও সে জানে। বাস্তবতার সঠিক জ্ঞান নিয়ে বিভিন্ন ঘটনা ও প্রেক্ষাপটের মোকাবিলা সে করতে পারে সুষ্ঠুভাবে।

এই কাঠামো তার চিন্তায় নিয়ে আসে শৃঙ্খলা, তাকে দেয় এক ভারসাম্যপূর্ণ মাপকাঠি। ইসলাম তার হৃদয়কে সুশৃঙ্খল করে হৃদয়ে এমনসব মূল্যবোধ গেঁথে দেয়, যা তার বুদ্ধিবৃত্তিক শৃঙ্খলা আর চারিত্রিক দৃঢ়তা বাড়ায়। তাকে সাহায্য করে প্রকৃতির নিয়মগুলোকে কার্যকরীভাবে বুঝতে ও কাজে লাগাতে।

আমরা যখন আল্লাহর সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী, শুধু তাঁকেই স্রষ্টা, রিয্‌কদাতা, সর্বশক্তিমান এবং সর্বজ্ঞানী হিসেবে মেনে নেওয়া মুসলিমের সাথে অন্য কোনো ওয়ার্ল্ডভিউতে বিশ্বাসী মানুষের তুলনা করব, তখন এ বিষয়টি আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট হবে।

এমন কোনো মানুষের কথা চিন্তা করুন, যে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দেবতায় বিশ্বাস করে। এক দেবতা কল্যাণের, আরেক দেবতা মন্দের। অথবা এমন কারও কথা চিন্তা করুন, যে এমন ঈশ্বরকে নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে হিমশিম খায়, যে ঈশ্বর অস্তিত্ববান; কিন্তু একইসাথে আবার অনস্তিত্বের সাথেও মিশ্রিত। কিংবা এমন কারও কথা চিন্তা করুন, যে এমন ঈশ্বরে বিশ্বাসী, যে ঈশ্বর তার ব্যাপারে কিছু জানে না এবং মহাবিশ্বের ব্যাপারেও জানে না। অথবা এমন মানুষের কথা ভেবে দেখুন, যে 'বস্তু' আর 'প্রকৃতি' নামক ঈশ্বরের কথা চিন্তা করে। এমন এক 'ঈশ্বর', যে শোনে না, দেখে না, যার মধ্যে নেই কোনো স্থায়িত্ব।

ইসলামের মাধ্যমে মানুষ তাঁর স্রষ্টা ও মালিকের পবিত্র বৈশিষ্ট্যগুলোকে বুঝতে শেখে। উপলব্ধি করতে শেখে চারপাশের দুনিয়াতে ঘটে যাওয়া ঘটন-অঘটনের সাথে মহান আল্লাহর সম্পর্ককে। একজন মুসলিম বুঝতে পারে কোন জিনিসগুলো আল্লাহর পছন্দনীয় এবং কোনগুলো তাঁর অপছন্দের। সে বোঝে ঈমান ছাড়া, তাওহীদের জ্ঞান ছাড়া আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় না। মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে হলে তাঁর আদেশগুলোর ওপর দৃঢ় হতে হবে এবং তাঁর নাযিল করা বিধান মেনে চলতে হবে সর্বাবস্থায়। একজন মুসলিম বোঝে, আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক সন্তান কিংবা আত্মীয়ের মতো নয়। মহান আল্লাহর সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক মনিবের সাথে অনুগত দাসের সম্পর্কের মতো। যে দাস মালিক যা বলে, তা-ই করে। মালিক যা করতে মানা করে, তা থেকে দূরে থাকে এবং মালিক যে জীবনকে দাসের জন্য নির্ধারণ করেছে, জীবনের সেই পথই সে অনুসরণ করে। একজন মুসলিম বোঝে, আল্লাহ এবং তাঁর বান্দাদের মাঝে কোনো মধ্যস্থতাকারী নেই। এই উপলব্ধিগুলো মানুষের হৃদয় ও বুদ্ধিমত্তাকে দৃঢ়তা দেয়। পরিবর্তন আনে তার চিন্তা ও আচরণে।

তাওহীদের ধারণার সাথে খ্রিষ্টানদের ত্রিত্ববাদের ধারণার তুলনা ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের স্বচ্ছতা ও সরলতার মর্ম পুরোপুরি উপলব্ধি করতে আমাদের সাহায্য করবে। খ্রিষ্টানদের মতে, ঈশ্বর এক; কিন্তু তিনি তিনজন ব্যক্তি। এটি নাকি বিশ্বাসের একটি রহস্য! আর এই তিনজনের মধ্য থেকে শুধু পুত্রের মাধ্যমেই আখিরাতে মুক্তি লাভ করা সম্ভব। কারণ খ্রিষ্টানরা বিশ্বাস করে, প্রত্যেক মানুষ উত্তরাধিকারসূত্রে আদি পাপের ভাগীদার। আদি পাপ থেকে ক্ষমা পাওয়া সম্ভব শুধু এই 'পুত্র'; অর্থাৎ যিশু খ্রিষ্ট (আলাইহিস সালাম)-এর কুরবানির মাধ্যমে।

কিংবা ওই ব্যক্তির কথা চিন্তা করুন, যে নিজেকে দেখে প্রকৃতির সৃষ্টি হিসেবে। একবার ভেবে দেখুন তো, প্রকৃতি দেখে না, শোনে না, আদেশ-নিষেধ করে না, প্রকৃতি কল্যাণে উদ্‌বুদ্ধ করে না, অন্যায়, অশ্লীলতা ও অনৈতিকতা থেকে নিরুৎসাহিত করে না। এমন 'স্রষ্টা'য় বিশ্বাসী মানুষ কীভাবে দৃঢ়তার সাথে কোনো পথ অনুসরণ করবে? তার মন ও মস্তিষ্কে স্থিরতা আসবে কীভাবে? বস্তু কিংবা প্রকৃতি নামক স্রষ্টার ব্যাপারে তাদের কোনো নিশ্চিত জ্ঞান নেই। প্রতিদিন তারা নতুন কিছু জানার আশায় বসে থাকে। তাদের সামনে থাকা পথ লক্ষ্যহীন, এলোমেলো।

'চিন্তার মরুপ্রান্তর ও ধ্বংসস্তূপ' অধ্যায়সহ অন্যান্য অধ্যায়গুলোতে আমরা এধরনের বিভিন্ন ওয়ার্ল্ডভিউ ও আকীদা নিয়ে আলোচনা করেছি। বিভ্রান্তি, অসারতা, জটিলতা আর অনর্থক বুদ্ধিবৃত্তিক কসরতের কারণে এসব ধারণা কখনোই তাঁদের অনুসারীদের মধ্যে মজবুত ওয়ার্ল্ডভিউ এবং আচরণ তৈরি করতে পারবে না।

একজন আন্তরিক মানুষ যখন প্রথমবারের মতো ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের মুখোমুখি হয়, তখন এই দ্বীনের সরলতা, সহজবোধ্যতা এবং স্পষ্টতা তার মন ও মস্তিষ্ককে আকৃষ্ট করে। ইসলামের এই বৈশিষ্ট্য অতীতে এবং বর্তমানে এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে শুরু করে ইউরোপ ও অ্যামেরিকা পর্যন্ত সারা বিশ্বের মানুষকে আকৃষ্ট করে যাচ্ছে। সহজ-সরল, সোজাসাপ্টা সত্যের প্রতি আকর্ষণ মানবপ্রকৃতির অংশ। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এ আকর্ষণ কাজ করে, ওই মানুষ যে সমাজ বা সভ্যতারই হোক না কেন।

তাওহীদের বিশ্বাস ব্যক্তিকে সমন্বিত করে। মুসলিম সমাজকেও একীভূত ও শক্তিশালী করে এ বিশ্বাস। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ ব্যক্তিত্ব এবং সমাজের ভাঙন প্রতিরোধ করে, অন্য ওয়ার্ল্ডভিউগুলোর ক্ষেত্রে এ কথা খাটে না।

মানুষের ব্যক্তিত্বকে গঠন করা হয়েছে এক অবিভাজ্য একক হিসেবে। ইসলাম মানুষকে আল্লাহমুখী করে। আকীদা, ওয়ার্ল্ডভিউ, ইবাদাত, ভক্তি, আইন, শাসন, নৈতিকতা, সামাজিক বিন্যাসসহ দুনিয়া ও আখিরাতের সবক্ষেত্রে তাকে নির্ভরশীল করে এক আল্লাহর ওপর। ইসলাম মানুষকে একাধিক ঈশ্বরের মুখাপেক্ষী করে না। নানা রকমের শক্তির সামনে অবনত করে না তাকে।

ইসলামি শিক্ষাগুলো একটিমাত্র উৎস থেকে এসেছে। ব্যক্তিগত বিশ্বাস, ইবাদাত, পুরো সমাজ কিংবা জাতির জীবনব্যবস্থা—সব শিক্ষার উৎস এক। এখানে বিশ্বাস আর দৈনন্দিন জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। মানবজীবনের জন্য দেওয়া বিধানগুলো ওই একই মহাজাগতিক ব্যবস্থার অংশ, যা দিয়ে পুরো বিশ্ব পরিচালিত হয়। এই সর্বজনীন বিধান ও আইন মেনে চলার মাধ্যমে মানুষ নিজেদের মধ্যে এবং সৃষ্টিজগতের সাথে সংঘাত ও বিভাজন এড়িয়ে চলতে পারে। ইসলামি জীবনব্যবস্থার অনুসরণের মাধ্যমে অর্জিত হয় সামাজিক ও মহাজাগতিক সংহতি ও ভারসাম্য।

এই সমন্বয় এমন এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি তৈরি করে, যার সামনে দাঁড়াতে পারে না কোনোকিছুই। এ কারণেই প্রথম প্রজন্মের মুসলিমদের অর্জনগুলোকে আমাদের কাছে এখন প্রায় অতিমানবীয় বলে মনে হয়। এ ধরনের অর্জন সম্ভব হয়েছিল ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ পরিপূর্ণভাবে আত্মস্থ করার কারণে। এই ওয়ার্ল্ডভিউ একীভূত ক্ষমতার জন্ম দেয়। এমন এক শক্তির জন্ম দেয়, যা মানবপ্রকৃতিকে সমন্বিত ও শক্তিশালী করে, আল্লাহর নিয়ামাত ও বরকত গ্রহণের জন্য মানুষকে প্রস্তুত করে এবং মহান আল্লাহর প্রতি সংবেদনশীল করে তোলে । এই শক্তিই ইসলামি ইতিহাসের অবিস্মরণীয় অর্জন ও বিজয়ের রহস্য।

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ, বিশেষ করে তাওহীদের বিশ্বাস মুসলিমদের বিবেক ও জীবনে এক অনন্য প্রভাব বিস্তার করে। অভাবনীয় প্রভাব ফেলে ব্যক্তি ও সামষ্টিক পর্যায়ে; ইসলামি সমাজ, এর অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম এবং সংগঠনের ক্ষেত্রে। আর এভাবেই আসে মানবজাতির সত্যিকারের মুক্তি। এভাবেই জন্ম হয় প্রকৃত মানুষের।

ইবাদাতের নিয়মগুলো যেমন এক আল্লাহর কাছ থেকে গ্রহণ করতে হয়, ঠিক তেমনিভাবে জীবনের নিয়ম, আইন ও বিধানগুলোও নিতে হয় আল্লাহর কাছ থেকে। মহান আল্লাহর একত্ব, অনন্যতা এবং পবিত্র বৈশিষ্ট্যগুলো বোঝার অর্থ হলো এই প্রগাঢ় সত্যকে অনুধাবন করা। সার্বভৌমত্ব মহান আল্লাহর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলোর অন্যতম। কোনো মুমিন এ কথা অস্বীকার করবে না। এ ব্যাপারে কুরআনের বক্তব্য স্পষ্ট, এ নিয়ে সন্দেহের কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ জাল্লা ওয়া আলা বলেছেন,

> বিধান একমাত্র আল্লাহরই। তিনি আদেশ করেছেন, তাঁকে ছাড়া আর কারও ইবাদাত না করতে। এটাই শাশ্বত দ্বীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (সূরা ইউসুফ, ১২ :৪০)
>
> তাদের কি এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদের জন্য দ্বীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? (সূরা শূরা, ৪২ : ২১)
>
> ...আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, সে অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না, তারাই কাফির। (সূরা মায়িদা, ৫ : ৪৪)
>
> কিন্তু না, আপনার রবের কসম! তারা মুমিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার ভার আপনার ওপর অর্পণ না করে; অতঃপর আপনার ফায়সালার ব্যাপারে তাদের মনে কিছু মাত্র কুণ্ঠাবোধ না থাকে, আর তারা তার সামনে নিজেদেরকে পূর্ণরূপে সমর্পণ করে। (সূরা নিসা, ৪ : ৬৫)

ইসলাম ইবাদাতের বিধান আর সামাজিক জীবনের বিধানের মধ্যে পার্থক্য করে না। দুধরনের বিধান এসেছে একই উৎস থেকে। মহান আল্লাহর একত্ব এবং তাঁর চূড়ান্ত সার্বভৌমত্বে ঈমান আনার দাবি হলো—এই দুধরনের বিধানের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের পার্থক্য না করা। যে এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য করেছে, সে পরিপূর্ণভাবে ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তার মধ্যে মহান আল্লাহ এবং তাওহীদের বিশ্বাস নেই। ওপরে আমরা কুরআনের যে আয়াতগুলো উল্লেখ করলাম, তার মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। এখন আমরা আরেকটি আয়াত উল্লেখ করছি, যা এক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

> (আহলে কিতাবরা) আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়ামপুত্র মাসীহকেও। অথচ এক ইলাহের ইবাদাত করার জন্যই তারা আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো সত্য ইলাহ নাই। তারা যে শরীক করে, তা থেকে তিনি কত না পবিত্র! (সূরা তাওবা, ৯ : ৩১)

এই আয়াতে আহলে কিতাবদের কথা বলা হচ্ছে, যারা ঈসা (আলাইহিস সালাম) এবং সন্ন্যাসী ও ধর্মযাজকদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছিল। আমরা জানি খ্রিষ্টানরা ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর ইবাদাত করে। এটাকে এ আয়াতে আল্লাহ বলছেন, ‘রব হিসেবে গ্রহণ করা’। কিন্তু খেয়াল করুন, এ আয়াতে আল্লাহ আরও বলছেন যে, তারা তাদের ধর্মযাজক এবং সন্ন্যাসীদের আল্লাহর পাশাপাশি

রব হিসেবে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ইয়াহূদি ও খ্রিষ্টানরা তাদের সন্ন্যাসী ও ধর্মযাজকদের ইবাদাত করত না। তাদের প্রতি রুকূ', সাজদা করত না। বরং সন্ন্যাসী ও ধর্মযাজকদের কাছ থেকে তারা জীবনের বিধান আর আইন গ্রহণ করত। আর এই কাজকেও আল্লাহ "রব হিসেবে গ্রহণ করা" বলেছেন। রব হিসেবে আল্লাহর ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করা এবং আল্লাহর বদলে অন্য কারও আইন বা বিধান গ্রহণ করা—দুটোকেই আল্লাহ স্বয়ং উল্লেখ করেছেন একসাথে। দুটোকেই আল্লাহ শিরক বলেছেন। এক আল্লাহর ইবাদাত করা, এক আল্লাহকে আইন ও বিধানদাতা হিসেবে গ্রহণ করা—দুটোই তাওহীদের অংশ। যেকোনো একটি প্রত্যাখ্যান করার অর্থ আল্লাহর বদলে অন্য কাউকে রব হিসেবে গ্রহণ করা। মহান আল্লাহর সাথে শিরক করা।

রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই আয়াতের স্পষ্ট, সোজাসাপ্টা ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যে ব্যাখ্যার পর আয়াতটির অর্থ নিয়ে প্রশ্ন তোলার আর কোনো সুযোগই থাকে না। সাহাবি আদি ইবনু হাতিম (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত বিখ্যাত একটি হাদীসে[5] এসেছে,

> "একদা আমি নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এলাম। তখন আমার গলায় একটি স্বর্ণের ক্রুশ ঝুলছিল। তিনি বললেন, 'আদি, এই প্রতিমা তোমার নিকট থেকে খুলে ফেলো।' আমি শুনতে পেলাম তিনি সূরা তাওবার এই আয়াত পাঠ করলেন,
>
> > আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে...
>
> নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুখে উক্ত আয়াত শুনে আমি আরজ করলাম, 'ইয়াহূদি-নাসারারা তো কখনো তাদের আলিমদের ইবাদাত করেনি, তাহলে এটা কেন বলা হয়েছে, তারা তাদেরকে 'রব' বানিয়ে নিয়েছে?'
>
> নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'এ কথা ঠিক যে, তারা তাদের ইবাদাত করেনি। কিন্তু এটাও তো সঠিক যে, তাদের আলিমরা যা হালাল করেছে, তাকে তারা হালাল এবং যা হারাম করেছে, তাকে তারা হারাম বলে মেনে নিয়েছে। আর এটাই হলো তাদের ইবাদাত করা।'"[6]

সুদ্দি (রহিমাহুল্লাহ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন,

> "তারা মানুষের পরামর্শ খুঁজেছে আর আল্লাহর কিতাব পেছনে ছুড়ে ফেলেছে। এ কারণেই আল্লাহ বলেছেন, 'অথচ এক ইলাহের ইবাদাত করার জন্যই তারা আদিষ্ট হয়েছিল।' অর্থাৎ আল্লাহ যদি কোনোকিছুকে নিষিদ্ধ করেন, তাহলে সেটা হারাম, আল্লাহ যদি কোনোকিছুকে বৈধ করেন, তাহলে সেটা হালাল। তিনি যা-ই বিধান দিয়েছেন, তা অনুসরণ করতে হবে। তিনি যা যা আদেশ করেছেন, তা বাস্তবায়ন করতে হবে।"[7]

এভাবে ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ মানুষকে সৃষ্টির দাসত্ব থেকে মুক্ত করে স্রষ্টার দাসে পরিণত করে। সৃষ্টির দাসত্ব থেকে মুক্ত হবার আগে মানুষ সত্যিকার অর্থে আশরাফুল মাখলূকাত হয়ে উঠতে পারে না।

সব ওয়ার্ল্ডভিউয়ের মধ্যে কেবল ইসলামই সার্বভৌমত্ব এবং চূড়ান্ত আইনপ্রণয়ন এক আল্লাহর দিকে ন্যস্ত করে। এভাবে সৃষ্টির

আনুগত্য থেকে বের করে এনে মানুষকে স্রষ্টার প্রতি অনুগত করে। যে ব্যবস্থায় আইন প্রণয়নের ক্ষমতা এবং সার্বভৌমত্ব মানুষের, সেখানে মানুষ গোলামি করে মানুষের। কিন্তু ইসলামে এবং কেবল ইসলামেই প্রতিটি মানুষ এই ধরনের গোলামি থেকে মুক্ত হয়ে এক আল্লাহর গোলামি করে। এটাই মানুষের সত্যিকার মুক্তি, এটাই হলো মানুষের জন্ম। সম্পূর্ণভাবে সৃষ্টির দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার পরই কেবল প্রকৃত অর্থে মানুষের জন্ম হয়। এ দাসত্ব বিশ্বাস কিংবা বিবেকের হতে পারে কিংবা হতে পারে আইনকানুন, আচরণ কিংবা জীবনব্যবস্থারও।

ইসলামি জীবনব্যবস্থা ছাড়া প্রকৃত মানবতা পূর্ণাঙ্গভাবে অস্তিত্বে আসতে পারে না। মহান আল্লাহর একত্ব ও তার সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস এমন এক আসমানি উপহার, যা মানবজাতির জন্য দিকনির্দেশনা। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য আরও একটি উপহার নিচের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেছেন,

> আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নিয়ামাত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে। (সূরা মায়িদা, ৫ : ৩)

ঈমানদাররা পুরো মানবজাতিকে এই উপহার গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। মুসলিমরা এই নিয়ামাত ভাগ করে নিতে চায় সবার সাথে। যাতে অন্যরাও এ উপহার থেকে উপকৃত হতে পারে, সন্তুষ্ট করতে পারে মহান আল্লাহকে। এটাই সেই মহান বার্তা, যা তাওহীদে বিশ্বাসীরা মানবজাতির কাছে আজ পৌঁছে দিতে পারে। যেভাবে পৌঁছে দিয়েছিলেন আমাদের মহান পূর্বপুরুষরা। আজও মানুষ উদ্গ্রীব হয়ে এই বার্তা গ্রহণ করে। তাওহীদের আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য। ইসলাম এমন কিছু দেয়, যা আজ মানবজাতি হারিয়ে ফেলেছে। এমন কিছু যা অন্য কোনো ওয়ার্ল্ডভিউ, বিশ্বাস, মতবাদ, মতাদর্শ কিংবা সংবিধান দিতে পারে না।

কাদিসিয়ার যুদ্ধের আগে সাহাবি রিবঈ ইবনু আমর (রদিয়াল্লাহু আনহু) আসলেন পারস্য সেনাপতি রুস্তমের কাছে।

রুস্তম প্রশ্ন করল, ‘তোমরা কেন এসেছ?’

রিবঈ ইবনু আমর (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর জবাব ছিল সংক্ষিপ্ত। কিন্তু সংক্ষিপ্ত সেই উত্তরেই তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন ইসলামের বার্তাকে। তিনি স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেছিলেন ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ এবং এ থেকে জন্ম নেওয়া মহান আন্দোলনের নির্যাসকে। রুস্তমের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন,

> আমাদের পাঠিয়েছেন আল্লাহ। যারা মানুষের গোলামি থেকে বের হয়ে এক আল্লাহর গোলামি করতে চায়, যারা দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে বের হয়ে আখিরাতের প্রশস্ততার দিকে যেতে চায়, ধর্মের স্বৈরাচার থেকে বের হয়ে যারা আসতে চায় ইসলামের ইনসাফের দিকে—আল্লাহ আমাদের পাঠিয়েছেন তাদেরকে মুক্ত করতে।

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ যে ধরনের জীবনব্যবস্থা তৈরি করে, এর আলোকে মুসলিমরা সৃষ্টিজগতের মাঝে যেভাবে নিজেদের ভূমিকাকে দেখে—সেই পুরো উপলব্ধিকে এই অল্প কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে ধারণ করা যায়। মুসলিমের দায়িত্ব হলো পুরো বিশ্বের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া—

> নিশ্চয়ই ইসলাম হলো মানুষের গোলামি থেকে মহান আল্লাহর গোলামির দিকে যাত্রা। সবকিছু; তা এই দুনিয়ার সাথে সম্পর্কিত হোক অথবা আখিরাতের, মহান আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী চালানোর সংকল্প। মহান আল্লাহর পবিত্র বৈশিষ্ট্যসমূহ শুধু তাঁরই জন্য নির্ধারিত করার প্রতিজ্ঞা।
>
> ইসলাম হলো সৃষ্টির দাসত্ব থেকে স্রষ্টার দাসত্বে মানুষকে ফিরিয়ে আনা। জীবনের সব ক্ষেত্রে, সব বিষয়ে মহান আল্লাহর কর্তৃত্ব মেনে নেওয়া। সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ ও বিধানদাতা হিসেবে গ্রহণ করা শুধু তাঁকেই। আল্লাহর কাছে একান্ত আত্মসমপর্ণ করা ছাড়া মানুষ কখনো মুক্ত হতে পারে না, কখনো সত্যিকার অর্থে মানুষ হয়ে উঠতে পারে না।

সার্বভৌমত্ব এক আল্লাহর বৈশিষ্ট্য। যে তাঁর আনুগত্য ভাগ করে একভাগ আল্লাহকে দেয়, আরেক ভাগ অন্য কারও জন্য নির্ধারণ করে, সে বিশ্বাসী হতে পারে না। আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা একমাত্র আল্লাহর প্রতি—এই উপলব্ধি ছাড়া মানুষের মুক্তি সম্ভব নয়।

ইসলামের ওয়ার্ল্ডভিউ আঁকড়ে ধরে, তাওহীদের পতাকা উঁচিয়ে তুলে মুসলিমরা মানবজাতিকে আজ সেই একই কথা বলতে পারে, যে কথা রুস্তমকে বলেছিলেন সাহাবি রিবঈ ইবনু আমর (রদিয়াল্লাহু আনহু)। এ কথাগুলো তিনি বলেছিলেন এমন এক পরিস্থিতিতে, যার সাথে আজকের পরিস্থিতির আছে অনেক সাদৃশ্য। তখনকার মতো আজও সৃষ্টির গোলামিতে হাবুডুবু খাচ্ছে মানবজাতি। সামগ্রিকভাবে তাওহীদের বিশ্বাস আঁকড়ে ধরাই পারে সৃষ্টির গোলামি থেকে বের করে এনে মানবজাতিকে এক আল্লাহর গোলামিতে প্রবেশ করাতে। এভাবেই মানুষ পারে নিজেকে মুক্ত করতে, প্রকৃত অর্থে মানুষ হয়ে উঠতে।

ইসলামি জীবনব্যবস্থায় ফেরার প্রতি আহ্বান করার মাধ্যমে তাওহীদে বিশ্বাসীরা বিশ্বকে এমন কিছু দিতে পারে, যা অন্য কোনো ধর্ম, মতবাদ, ব্যবস্থা, দর্শন কিংবা সংবিধানে পাওয়া যায় না। পুরো বিশ্বের রূপান্তরে ভূমিকা রাখার এ এক মহান ও ঐতিহাসিক সুযোগ। আজ যারা তাওহীদের এ পতাকা উঁচিয়ে ধরবে, তাদের ভূমিকা হবে পুরো মানবজাতির নেতৃত্ব দেওয়ার। ঠিক যেমন চৌদ্দশ বছর আগে ইসলামের প্রথম প্রজন্ম মানবজাতির নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল জাযিরাতুল আরব থেকে।

আজ মুসলিমদের দেখানোর মতো কোনো বৈজ্ঞানিক কিংবা প্রযুক্তিগত অর্জন নেই। চোখধাঁধানো সভ্যতাগত অর্জন নেই, যা দেখে পৃথিবীর বাকি মানুষ দলে দলে ছুটে আসবে তাঁদের কাছে। কিন্তু তাওহীদে বিশ্বাসীরা মানবজাতিকে এমন কিছু দিতে পারে, যা বিজ্ঞান-প্রযুক্তি এবং সভ্যতাগত অর্জনের চেয়েও অনেক অনেক মূল্যবান। আর তা হলো মানুষের মুক্তি—না, শুধু মানুষের মুক্তি নয়, বরং সত্যিকার অর্থে মানুষের জন্ম, যেমনটা মহান আল্লাহ চেয়েছেন।

তাওহীদের বিশ্বাসীরা মানবজাতিকে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা দিতে পারে, এমন এক ব্যবস্থা যার ভিত্তি হলো মানুষের মর্যাদা এবং সব ধরনের বন্দিত্ব থেকে মানুষের বিবেক ও আত্মার মুক্তি। তখন সৃষ্টির দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে মহান আল্লাহর খলীফা হিসেবে—শক্তিশালী ও মর্যাদাবান, যেমনটা আল্লাহ চেয়েছেন। মানুষ তখন আর পুঁজি, পণ্য, যন্ত্র, মতাদর্শ কিংবা নশ্বর মানুষের গোলামি করবে না। আল্লাহর খলীফা হিসেবে সে মহান আবিষ্কার করবে, সভ্যতার নতুন নতুন পথ উন্মোচন করবে, সে অবস্থান করবে মুক্তির শিখরে, মর্যাদার সাথে।

যদি আমরা কল্যাণময় কিছু বলে থাকি, তাহলে নিঃসন্দেহে সকল প্রশংসা তো জগৎসমূহের মালিক আল্লাহরই।

[1] আখেনাতেন : আখেনাতেন (মৃ. ১৩৩৪/১৩৩৬ খ্রিষ্টপূর্ব) প্রাচীন মিশরের একজন ফিরআউন। তার শাসনকাল ধরা হয় খ্রিষ্টপূর্ব ১৩৫৩-১৩৩৬ পর্যন্ত। আখেনাতেন শাসনকাল একেশ্বরবাদী নীতির জন্য প্রসিদ্ধ। আখেনাতেন আতেন নামে এক সত্তার ইবাদাত করত, যার প্রতীক ছিল সূর্য। আধুনিককালে আখেনাতেনের কাহিনি প্রথম আলোচনায় উঠে আসে উনবিংশ শতাব্দীতে, যখন তার রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ এবং আখেনাতেন ও তার পরিবারের সমাধিস্থল আবিষ্কৃত হয়। তবে আখেনাতেনের ধর্মীয় অবস্থানের ব্যাপারটা সামনে আসে বিংশ শতাব্দীতে আরেক ফিরআউন তুতানখামেনের সমাধিস্থল আবিস্কারের পর। বিখ্যাত মিশরীয় রানি নেফারতিতি ছিল আখেনাতেনের স্ত্রী। (অনুবাদক)

[2] জেনেসিস/আদিপুস্তক ৬ : ১-৮। এ বইয়ের 'চিন্তার মরুপ্রান্তর ও ধ্বংসস্তূপ' অধ্যায়—দ্রষ্টব্য। (অনুবাদক)

[3] এমতাবস্থায় সমগ্র জগতে এক ভাষা ও এক সাধারণ বাচনভঙ্গি ছিল। মানুষজন যেমন যেমন পূর্বদিকে সরে গেল, তারা শিনারে এক সমভূমি খুঁজে পেল এবং সেখানেই বসতি স্থাপন করল।

তারা পরস্পরকে বলল, "এসো, আমরা ইট তৈরি করি ও সেগুলি পুরোদস্তুর আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করে নিই।" তারা পাথরের পরিবর্তে ইট, ও চুনসুরকির পরিবর্তে আলকাতরা ব্যবহার করল। পরে তারা বলল, "এসো, আমরা নিজেদের জন্য গগনস্পর্শী এক মিনার সমেত এক নগর নির্মাণ করি, যেন আমাদের নামডাক হয় ও সমগ্র পৃথিবীতে আমাদের ছড়িয়ে পড়তে না হয়।"

কিন্তু সদাপ্রভু সেই নগর ও মিনারটি দেখার জন্য নেমে এলেন, যেগুলি সেই মানুষেরা তখন নির্মাণ করছিল। সদাপ্রভু বললেন, "এক ভাষাবাদী মানুষ হয়ে যদি তারা এরকম করতে শুরু করে দিয়েছে, তবে তারা যাই করার পরিকল্পনা করুক না কেন, তা তাদের অসাধ্য হবে না। এসো, আমরা নিচে নেমে যাই ও তাদের ভাষা গুলিয়ে দিই, যেন তারা পরস্পরের কথা বুঝতে না পারে।" জেনেসিস/আদিপুস্তক, ১১ : ১-৮। (অনুবাদক)

[4] জেনেসিস/আদিপুস্তক, ৩২ : ২২-৩২ (অনুবাদক)

[5] তিরমিযি, কিতাবুত তাফসীর, সূরা তাওবা অধ্যায়, হাদীস নং ৩০৯৫। আদির হাদীসটির আরও কয়েকজন উল্লেখকারী ও গ্রন্থের নাম : আল-বাইহাকি, আস-সুনানুল কুবরা, ১০/১১৬; আল-খতীব, আল-ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, ১/৬৬-৬৭; আত-তাবারি (একাধিক সূত্রে) ১৪/২০৯-২১১; আস-সুয়ূতি, আদ-দুররুল মানসূর, ৪/১৭৪, দারুল ফিকর সংস্করণ।

"হাদীসটির ব্যাপারে ইমাম তিরমিযি বলেছেন, হাদীসটির বর্ণনাসূত্র গরীব। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যার মতে হাদীসটি হাসান।

‘মাজমূউল ফাতাওয়া’র আল-ঈমান অংশে তিনি এ রায় দেন (৭/৬৭)। আরও বলেন, “তিরমিযি ও অন্যরা এটি আদি থেকে বর্ণনা করেছেন।” (মিনহাজুস সুন্নাহ, ১/৪৮)। এছাড়া আল-আলবানিও ‘গায়াতুল মারাম’ গ্রন্থে এটিকে হাসান বলেছেন, হাদীস নং ৬। সহীহুত তিরমিযির মাকতাবুত তারবিয়াহ আল-আরাবি সংস্করণেও এটি আছে, হাদীস নং ৪৭১। বর্ণনাসূত্রটিকে অনেকেই হাসান বলে আখ্যায়িত করার কারণ হলো হুযাইফা ও অন্যান্যদের থেকে আসা বর্ণনা, যা এই বর্ণনাটিকে শক্তিশালী করে [পরের ফুটনোট দ্রষ্টব্য]। এখানে ভিন্নমতের কোনো সুযোগ নেই।” সূত্র : অপরিহার্য শরীয়াহ, আব্দুর রাহমান ইবনু সালিহ আল-মাহমুদ, পৃষ্ঠা ৬৯ (সম্পাদকের টীকা), ইলমহাউস পাবলিকেশন। (অনুবাদক)

[6] অনুরূপ বর্ণনা এসেছে একাধিক সালাফের কাছ থেকে। বর্ণনাগুলো উল্লেখ করেছেন আত-তাবারি, আল-খতীব আল-বাগদাদি, আস-সুয়ূতি প্রমুখ। এর মাঝে রয়েছে : হুযাইফা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বর্ণনা। তাঁকে আলোচ্য আয়াতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলো, “ওরা কি তাদের (পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদের) পূজো করে?”

তিনি বললেন, “না। কিন্তু তারা কোনো কিছুকে হালাল বানালে তারা সেটাকে হালাল হিসেবে গ্রহণ করত, কিছুকে হারাম বানালে সেটাকে হারাম হিসেবে গ্রহণ করত।”

আরেক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, “ওরা তাদের (পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদের) জন্য সিয়াম পালন করত না এবং তাদের কাছে দুআ করত না বটে; কিন্তু তারা কিছুকে হালাল বানালে তারা সেটাকে হালাল হিসেবে গ্রহণ করত, কিছুকে হারাম বানালে সেটাকে হারাম হিসেবে গ্রহণ করত। আর এভাবেই ওরা তাদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে।” তাফসীরুত তাবারি, ১৪/২১১-২১৩; তাফসীরু আব্দির রাযযাক, ২/২৭২; সুনানুল বাইহাকি, ১০/১১৬; শুআবুল ঈমান, ৭/৪৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ সংস্করণ; আল-খতীব, আল-ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, ২/৬৭।

আর-রাবী ইবনু আনাস উক্ত আয়াতের ব্যাপারে বলেন,

“আবুল আলীয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘আচ্ছা বনী ইসরাঈল যে তাদের পণ্ডিতদের রব বানিয়ে নিয়েছে, এটা কী রকম?’ তিনি বললেন, ‘তারা আসমানি কিতাবের আদেশ-নিষেধ জানার পরও বলত যে, পুরোহিতরা না বলা পর্যন্ত আমরা কোনো সিদ্ধান্তে আসব না। তারা যে আদেশ করবে, তা মানব, যা থেকে নিষেধ করবে, তা মেনে চলব। এভাবে তারা আল্লাহর কিতাবকে পেছনে ছুড়ে মেরে অনুসরণ করে মানুষের কথা।’” ইবনু তাইমিয়্যা, আল-ঈমান, পৃষ্ঠা ৬৪; আত-তাবারি, ১৪/২১২।

এসব বর্ণনা সাহাবিগণের ব্যক্তিগত মত নয়। আদি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীস অনুসারেই এগুলো উক্ত আয়াতের তাফসীর। এ আয়াতের ব্যাপারে সালাফে সালিহীন এবং ইসলামি ইতিহাসের প্রখ্যাত মুফাসসিরগণের ব্যাখ্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর, সারসংক্ষেপস্বরূপ শাইখ আব্দুর রাহমান ইবনু সালিহ আল-মাহমুদ বলেছেন, “রব হিসেবে গ্রহণ করার জন্য সাজদা করা বা দুআ করা জরুরি নয়। অন্যকে রব হিসেবে গ্রহণ করার অর্থ হলো আল্লাহর দেওয়া হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করার ক্ষেত্রে তাকে মান্য করা। ইয়াহূদি-খ্রিষ্টানরা যে তাদের পুরোহিতদের প্রতি সাজদা করত না, তাদের কাছে দুআও করত না, সালাফগণ এটা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।”

এই উদ্ধৃতি এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, অপরিহার্য শরীয়াহ, আব্দুর রাহমান ইবনু সালিহ আল-মাহমুদ, ইলমহাউস পাবলিকেশন। আগ্রহী পাঠক আরও দেখতে পারেন, আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম (রহিমাহুল্লাহ) রচিত তাহকীমুল কাওয়ানীন; আল্লামা মুহাম্মাদ আল-আমিন আশ-শানকিতি (রহিমাহুল্লাহ) রচিত প্রখ্যাত তাফসীর আদ্বওয়াউল বায়ান থেকে এ সংক্রান্ত আয়াতগুলোর আলোচনা, বিশেষ করে তৃতীয়, চতুর্থ ও সপ্তম খণ্ডে; আল্লামা আহমাদ শাকির (রহিমাহুল্লাহ) রচিত হুকমুল জাহিলিয়্যাহ, উমদাতুত তাফসীর এবং তাঁর রচিত আকীদাতুত ত্বহাবিয়্যাহর ব্যাখ্যা গ্রন্থে এ আয়াতসমূহ সংক্রান্ত আলোচনা।

[7] ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৪/১১৯।